পরিবেশ এবং কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য

আমরা কোথায় থাকি আর কোথায় কাজ করি তার ওপর আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। পরিবেশ দূষণ কী ভাবে আমাদের স্বাস্থ্য ধ্বংস করে তা আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি। পরিবেশ বলতে বোঝায় আমাদের খাদ্য, জীবনযাত্রার ধরণ, এবং বাসস্থানের আবহাওয়া। প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা, জন্মরোগ, ক্যানসার ও আরও বিভিন্ন অসুখের জন্যে পার্শ্বিক ভাবে দায়ী করা যায় পরিবেশকে। বাতাস, মাটি, খাদ্য, ও জলের মধ্যে দিয়ে কলকারখানার রাসায়নিক বস্তু, কীটনাশক, এবং অন্যান্য বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের ঘরে ব্যবহৃত নানান কেমিক্যাল, ই–কোলাই জাতীয় জীবাণু, এবং কর্মক্ষেত্র ও বাড়ির চাপ আমাদের অসুস্থ করে তোলে।

আমাদের ক্রমবর্ধমান দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে কল–কারখানা বাড়ছে। সেই সব কারখানায় বর্জ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বহুকাল পর্যন্ত তেমন ভাবনা–চিন্তা করা হয় নি। এখন অবশ্য সবদেশেই কল–কারখানার দূষিত বর্জ্যের বিষয়ে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে সেই নিষেধাজ্ঞা আমাদের দেশে অক্ষরে অক্ষরে কতটা মানা হচ্ছে তা একটা বড় প্রশ্ন। জীবনযাত্রার ঢঙ পরিবর্তনে অনিহা, পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে ঔদাসিন্য ও অজ্ঞতা, মুনাফাবাজি, বিভিন্ন কর্মী ইউনিয়নের বাধা সৃষ্টি, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, ইত্যাদি মিলে দূষণ মুক্তি এক বিশাল সমস্যায় দাঁড়িয়েছে। এর একটি সহজ উদাহরণ হল কলকাতায় গাড়ির ধোঁয়ার দূষণ। কলকাতায় বায়ু–দূষণ ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছলেও বহু বছর এটি বন্ধ করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নি। অবশেষে এক পরিবেশকর্মীর নিরন্তর প্রচেষ্টায় বহু বছর বাদে আইনী নির্দেশে দূষণযুক্ত গাড়ি বন্ধ করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এই নির্দেশের পরেও বহু দূষণ সৃষ্টিকারী গাড়ি এবং অটো তা মানতে রাজি নয়। তবু আশা করা যায় কলকাতাতে বায়ু দূষণ বন্ধ হয়ে আবহাওয়া পরিষ্কার হবে। তবে যেখানে পুলিশী ব্যবস্থা শিথিল সেই শহরতলীতে এ নিয়ম কবে কার্যকরী হবে তা কে জানে!

দূষণের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে আমরা সকলেই অল্প–বিস্তর দায়ী। প্লাস্টিকের ব্যাগ নিকাশী নালাগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে জেনেও আমরা সেগুলো ব্যবহার করি আর যত্রতত্র ফেলি; যে দূষণ সৃষ্টিকারী অটো বেআইনী ভাবে রাস্তায় চলছে তাতে চড়ি; জলাভূমি সংরক্ষণ না করে তা ভরাট করে বাড়ি করি; পারদের থার্মোমিটার ব্যবহার করি; নিজেদের জঞ্জাল যেখনে সেখানে ফেলি – অর্থাৎ নিজেদের আপাতসুবিধা

ছাড়া অন্য কিছু সম্পর্কে ভাবি না। এই ব্যবহার সবসময়ে সচেতনতার অভাবে হয় তা নয়। সচেতনতার অভাব অনেক ক্ষেত্রে রয়েছে ঠিকই তবে অনেক সময়ে জেনে বুঝেও আমরা এ রকম ব্যবহার করি এই ভেবে যে 'আমি না করলেও অন্যেরা করবে' বা 'আমার একার ব্যবহারে কি আসে যায়'। তবে আমরা যদি স্পষ্ট বুঝতে পারি আমাদের আচরণ বাস্তবিকই সকলের স্বাস্থ্যের হানি করছে তা হলে হয়ত অনেকেই এমন যথেচ্ছ দূষণ করব না। এমনকি অন্যদের সঙ্গে এক জোট হয়ে এ বিষয়ে কিছুটা সামাজিক চাপও সৃষ্টি করতে পারি।

কল্যাণীতে স্বাস্থ্য উদ্যোগ

কলকাতার কাছেই কল্যাণী শহরের বড় সমস্যা ছিল আবর্জনা অপসারণ। কল্যাণীর ৫২–টি বস্তিতে প্রধানতঃ বাংলাদেশের উদ্বাস্তু ও হরিজনদের বাস। এই বস্তিগুলি থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করা বহুকালের সমস্যা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আবাসিকদের যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস। কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টার পরে বুঝতে পেরেছিলেন মানুষের ব্যবহারের জন্যে শৌচাগার তৈরি করলেই তার ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায় না। তাই তাঁরা একটি নতুন প্রয়াস নেন। কয়েকটি বস্তি চিহ্নিত করে সেখানে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করার অপকারিতা এবং নিজেদের বাসস্থান পরিষ্কার রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আবাসিকদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে আরম্ভ করেন। এই প্রয়াসের মূলে ছিল একটি বিশ্বাস – মানুষ অবুঝ নয়। ধৈর্য ধরে সহজ কথায় বোঝালে তারা বুঝতে পারবে। দারিদ্র্য মানুষকে বোধবুদ্ধিহীন করে না তার প্রমাণ কল্যাণীর এই প্রকল্প। কল্যাণীর এই দরিদ্র বস্তিবাসীরা নিজেরাই অর্থ ব্যয় করে নিজেদের শৌচাগার বানিয়েছেন। কল্যাণী মিউনিসিপ্যালিটির তদানীন্তন স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধানের কথায়, 'আমরা ধরে নি ওরা পারবে না, ওরা গরীব। ওদের জন্যে কিছু করতে আমাদেরই এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এই প্রকল্পে আমরা দেখেছি এই দরিদ্র মানুষও নিজেদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে টাকা খরচ করতে পিছপা হন না। এর জন্যে দরকার হল মানসিকতার পরিবর্তন। শৌচাগার ব্যবহার করার ইচ্ছে না জাগাতে না পারলে, টয়লেট বানিয়ে কোনও লাভ নেই'।

কর্মক্ষেত্র ও পরিবেশ – স্বাস্থ্য–সংকটে এ দুটির যোগাযোগ

স্বাস্থ্যের ওপর কর্মক্ষেত্র ও পরিবেশের প্রভাব আমরা আলাদা ভাবে দেখি। বহু দেশেই জীবনের এই বিশেষ দুটি অঙ্গ দেখভালের দায়িত্ব দুটি ভিন্ন সরকারী দপ্তরের ওপর থাকে। ভারতে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বা অক্যুপেশানাল হেলথ তদারকির জন্যে আলাদা কোন দপ্তর নেই। ভারতীয় সংবিধানে অবশ্য লেখা রয়েছে 'রাষ্ট্র খেয়াল রাখবে যাতে কাজের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু এবং মানবিক পরিবেশ বজায় থাকে'। এ ব্যপারে নজর রাখার দায়িত্বে যেসব সরকারী সংস্থা রয়েছে সেগুলি হল, ডিরেক্টর জেনারেল অফ দ্য ফ্যাক্টরি অ্যাডভাইসরি সার্ভিস এণ্ড লেবার ইনস্টিট্যুট (কারখানা আর বন্দর কর্মীদের জন্যে), ডিরেক্টর জেনারেল অফ মাইনস এণ্ড সেফ্‌টি (খনি শ্রমিকদের জন্যে), শ্রম মন্ত্রণালয় (নির্মাণকার্যে নিযুক্ত কর্মীদের জন্যে), ইত্যাদি। প্রসঙ্গত, অসংগঠিত কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দেখভালের জন্যে কোন সুনির্দিষ্ট দপ্তর নেই। পরিবেশ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে অবশ্য একটি সংস্থাই রয়েছে পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে কেন্দ্রীয় পরিবেশ দূষণ বা পল্যুশন বোর্ড।

কর্মক্ষেত্র ও পরিবেশ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সংস্থাগুলি পৃথক হলেও অনেক ক্ষেত্রে দূষণ জনিত সমস্যা শুধু কর্মক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে না, পরিবেশেও ছড়িয়ে পড়ে। যে বিষাক্ত বস্তু কারখানায় তৈরি হচ্ছে বা বর্জ্য হিসেবে বেরোচ্ছে, তার প্রভাব শুধু কারখানার অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সেই বিষাক্ত বস্তু জল, বাতাস, ও মাটির মাধ্যমে চারিদিকের স্কুল–কলেজ, ঘর–বাড়ি, রাস্তা–ঘাট, ও নদী–নালাতে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৪ সালে ইউনিয়ন কার্বাইড কীটনাশক তৈরির কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে ভূপালে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটায়। পঁচিশ বছর পরেও সেই গ্যাসের প্রভাবে উত্তর প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেই সঙ্গে পরিত্যক্ত কারখানা থেকে ক্রমাগত কীটনাশক বেরিয়ে স্থানীয় জল সরবরাহ দূষিত করে চলেছে।

কর্মী, স্থানীয় অধিবাসী, এমন কি স্থানীয় হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরাও অনেক সময়ে জানেন না তাঁদের বাড়ির কাছে যে কারখানা চলছে তাতে কি ধরণের রাসায়নিক বস্তু তৈরী হচ্ছে বা ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেগুলির জন্যে সেই অঞ্চলে কী কী সমস্যা হতে পারে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে কৃষিজমিতে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার চাষী, স্থানীয় লোকজন, এমন কি যাঁরা সেই ফসল কিনে খাচ্ছেন – তাঁদের স্বাস্থ্যের ওপর কী প্রভাব ফেলছে সে বিষয়ে আমাদের সচেতনতা এখনও খুবই কম। সুতরাং কোন কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠা করার আগে তার সুফলের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কুফলগুলিও বিবেচনা করে দেখতে হবে। সেই আলোচনায় প্রশাসন, সবুজায়নের কর্মী, বাণিজ্যিক কর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী সবাইকেই অংশগ্রহণ করে একটি সমঝোতায় আসতে হবে।

ভুল না ঠিক?

জীববিজ্ঞান অনুসারে পরিবেশ দূষণে মেয়েরা বেশি আক্রান্ত হয়

ঠিক। গবেষণায় দেখা গেছে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের শরীরে প্রায় ১০ শতাংশ বেশি চর্বি বা ফ্যাট থাকার দরুণ মেয়েদের শরীরে বিষাক্ত বস্তু বেশি পরিমাণে সংরক্ষিত হয়। এইসব বিষাক্ত বস্তু স্তনের ক্যানসার এবং জরায়ুর রোগ, যেমন এণ্ডোমেট্রিওসিস-এর জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়।

দূষণ রোধ করতে সক্ষম হলে আর চিন্তার কিছু নেই

ভুল। প্রথমত, সরকারী আইন থাকলেই যে তা বাস্তবায়িত হবে তা নয়। কলকাতায় বেশ অনেক বছর ধরেই আইনজারি করে মোটর গাড়ি থেকে বায়ু দূষণ বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এখনও আইন ভঙ্গ করা হচ্ছে। তাছাড়া সমস্ত গাড়ির বায়ু দূষণ বন্ধ করলেও পুরোন দূষণের জের বহু বছর ধরে চলবে। এখানে বলা যায় ডি ডি টি-র সঙ্গে ক্যানসারের যোগ লক্ষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু বছর আগেই এর ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বহু মার্কিন মহিলাদের শরীরে এখনও ডি ডি টি-র রেশ পাওয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ডি ডি টি ব্যবহার এখন বন্ধ। প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালে ভারতে সরকারী ভাবে ডি ডি টি ব্যবহার বন্ধ করা হলেও এখনও তার ব্যবহার সম্পূর্ণ রোধ করা যায় নি। তাছাড়া বিভিন্ন কারখানার দূষণ মানুষ, জমি, ও জলকে কলুষিত করে চলেছে। আমাদের দেশে দূষণ বিরোধী আইন রয়েছে কিন্তু মুনাফার স্বার্থে সেই আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং দায়িত্ব – যৌথ দায়িত্ব কিন্তু অসম বোঝা

আজকের পরিবেশ এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে তার কুফল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার কোন সম্ভাব্য পথ নেই। একটি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল বা পি সি বি আঠা, রঙ, ইলেকট্রিক ইন্সুলেটর, ছাপার কালি, যন্ত্র তৈলাক্তকরণ, ইত্যাদিতে বহুদিন ধরে ব্যবহার করা হয়েছে। এই পদার্থ ব্যবহারের ফলে শ্বেতী, যকৃতের রোগ, ও ক্যানসার হতে পারে এবং শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এছাড়া পি সি বি বন্যপ্রাণীও ধ্বংস করে। পরীক্ষায় দেখা গেছে মেয়েদের স্তন্যদুগ্ধে এবং পুরুষের বীর্যে অল্প পরিমাণ পি সি বি এখনও পাওয়া যায়।

এক সময়ে জলের পাইপ ঝালাই করতে, রঙে, পেট্রল ও অন্যান্য নানান নিত্য ব্যবহারিক জিনিষে সীসা যোগ করা হত। কিন্তু দেখা গেল এতে আমাদের

স্নায়ুপ্রণালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সব বিষাক্ত পদার্থগুলি প্রকৃতিতে এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে দক্ষিণ-মেরুর মতো সুদূর জনবসতিহীন বরফেও এগুলির রেশ পাওয়া গেছে!

পরিবেশ দূষণ থেকে কতটা আত্মরক্ষা করতে পারবো তা নির্ভর করে আমাদের সামাজিক সচেতনতা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার ওপর। অনেকে বোতলের পরিস্রুত জল কিনে পান করেন, জৈবিক উপায়ে তৈরি খাদ্য ছাড়া খান না, দামী চিকিৎসা কেন্দ্রে স্বাস্থ্য-পরিষেবা পেয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জীবনযাপন করেন। দরকার হলে এঁরা অপেক্ষাকৃত কম দূষিত পরিবেশে ভালোভাবে বাস করতে পারবেন। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে এ ভাবে বাঁচা সম্ভব নয়।

সাধারণত আমাদের দেশে গ্রামবাসীরা বেশি দূষণের শিকার হন। জলের স্তরে আর্সেনিক বেড়ে যাবার ফলে এবং বোতলের জল কেনার আর্থিক সংগতি না থাকায় তাঁরাই জল খেয়ে বেশি অসুস্থ হন। বাড়ির পাশের ক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহৃত হওয়ায় তাঁরাই এই সব বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে বেশি আসেন। কাছাকাছি স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকায়, থাকলেও সেখানে ভালো ডাক্তার বা ওষুধপত্র না থাকায় তাঁরাই সুষ্ঠু স্বাস্থ্য-পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হন। এছাড়া পয়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহ, শৌচাগারের এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতার অভাবে এঁরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

পরিবেশ দূষণ কমানোর জন্যে উন্নয়নশীল দেশে আরেকটি সমস্যা হল শক্তিশালী ব্যবসায়ীরা তাঁদের কারখানা বা কাজে দূষিত পদার্থ তৈরি ও ব্যবহার বন্ধ করতে চান না এবং অন্য কিছু ব্যবহার করার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি করেন। এই আপত্তির মূলে রয়েছে মুনাফা কমার ভয়। যেমন ভারতের রসায়ন শিল্প নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে জনগণের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদন বন্ধ করার বিরুদ্ধে বহুদিন থেকে আপত্তি জানিয়ে চলেছে। প্রশাসনও কলখারখানার প্রসারের গতি রুদ্ধ করতে চান না। ফলে পরিবেশ দূষণ মুক্তির ব্যাপারে অগ্রগতি হচ্ছে খুব ধীর গতিতে।

মেয়েদের কাজের জায়গার অবস্থা

আমাদের দেশে ৯৪ শতাংশ নারী শ্রমিক অসংগঠিত কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। ১৯৮৭ সালে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় কমিশন স্বনির্ভর এবং অসংগঠিত কাজে যুক্ত মেয়েদের ওপর একটা সমীক্ষা করেন। এই রিপোর্টটি 'শ্রমশক্তি' নামে প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে 'অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা প্রধানত কম পারিশ্রমিকে কঠিন, বৈচিত্র্যহীন, এবং অধিক সময়সাপেক্ষ কাজ করেন'। এই মহিলাদের অনেকেই কাজ করেন বিভিন্ন বাড়িতে। বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে গৃহকাজে নিযুক্ত মহিলাদের ওপর ঘরে বাইরে কাজের বোঝা

অত্যন্ত বেশি ও অমানবিক। গৃহস্থ বাড়িতে শ্রম দেবার পরে ঘরে ফিরেও তাঁদের সেই একই কাজ করতে হয়। গৃহস্থ বাড়িতে কাজ অনিশ্চিত এবং অসুস্থ হয়ে কাজে না গেলে মাইনে কাটা যাবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে অসুস্থ অবস্থাতেও এই মহিলাদের কাজ করতে হয়। অন্যান্য যেসব কাজ বহু মহিলারা করেন, যেমন সেলাইয়ের কাজ, বাজারে তরিতরকারি বিক্রি করা, আচার–বড়ি–গুঁড়ো মশলা ইত্যাদি বানানো, নির্মাণকাজে ইঁট–বালি বওয়া, ধান বুনে বা ধান কেটে চাষবাসে সাহায্য করা ইত্যাদি সবই অসংগঠিত কর্মক্ষেত্রে পড়ে। এগুলি প্রত্যেকটাই অতি অল্প পারিশ্রমিকের কাজ। মহিলারা নিজের ও সন্তানের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে এই কাজগুলি করেন, ফলে কাজের ক্ষেত্রে তাঁরা কোন অসুবিধার কথা জানাতে সাহস পান না। কাজে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোন বিপদ থাকলেও তাঁরা সোচ্চার হতে পারেন না। তবে মুখ ফুটে বললেও প্রতিকারের ব্যবস্থা সাধারণত থাকে না। সংগঠিত সংস্থায় কাজ করলে ছুটি, স্বাস্থ্য বিষয়ক সহায়তা, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড এর জামানো টাকা ইত্যাদি যে সব সুবিধা পাওয়া যায় অসংগঠিত কাজের ক্ষেত্রে সেগুলি নেই।

জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পূর্বসতর্কতার নীতি

অনেকের বিশ্বাস পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক বিধিনিষেধ কোন কাজে লাগে না; না পরিবেশ না মানুষ, কাউকেই এসব নীতি সঠিক ভাবে রক্ষা করে না। একটি পরিবেশ রক্ষার সংস্থা, অ্যালায়েন্স ফর হেলদি টুমরো বলেন আমাদের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের বিধিনিষেধের প্রধান ত্রুটি হল:

- সম্ভাব্য বিষাক্ত দ্রব্যগুলি ব্যবহারের আগে ভালো করে পরীক্ষা করা হয় না।
- যখন কোন অনিষ্ট হচ্ছে বলে প্রমাণিত হয় এবং সেই ক্ষতি ছড়িয়ে পড়ে কেবল তখনই প্রশাসন নড়েচড়ে বসে, তার আগে নয়।
- মানুষের কিছু অনিষ্ট যে হবেই প্রশাসন সেটা মেনে নেয়।
- নিজেদের সুবিধা রক্ষার্থে শক্তিশালী কিছু দল মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে প্রশাসনকে ক্রমাগত বাধা দেয়।

পরিবেশবন্ধু কিছু কিছু সংস্থা আমাদের জলবায়ু, খাদ্য, ও জমিজমার দূষণ রুখতে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন করে নতুন নীতি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। এই নীতির মূলসুত্র হল জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পূর্বসতর্কতা নিতে হবে। যেমন যদি কোন বস্তু বা কাজ মানুষের স্বাস্থ্য বা পরিবেশের অনিষ্ট করছে বলে মনে করা হয়, তাহলে নিশ্চিত প্রমাণ ছাড়াও তা বন্ধ করা হবে এবং তার বদলে অন্য কি করা যায় তার অনুসন্ধান করতে হবে।

স্বাস্থ্য–সংক্রান্ত নানান বিপদ

রাসায়নিক

প্রতি বছরই নতুন নতুন রাসায়নিক দ্রব্য বাজারে বিক্রি হচ্ছে। সময় নিয়ে এগুলি পরীক্ষা করা হয় নি বলে ভবিষ্যতে এগুলি মানুষের স্বাস্থ্যের কী ক্ষতি করতে পারে তা সঠিক জানা এখনই সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলি আমাদের জামাকাপড়ে, বাচ্চাদের খেলনায়, বাড়িতে, আসবাবপত্রে, খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে শুধু উন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নয়, এই সব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলি জল ও বায়ুবাহিত হয়ে পৃথিবীর প্রান্তসীমা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছচ্ছে। মনে রাখতে হবে আমাদের শরীর আলাদা ভাবে এক একটা অনিষ্টকর রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ পায় না, এক সঙ্গে সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করে। শরীরে সঞ্চিত বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের সমষ্টিকে বলা হয় বডি বার্ডেন বা 'দেহের বোঝা'। আমাদের দেহকে এই সমগ্র বোঝার সঙ্গে যুঝতে হয়। মিলিত ভাবে এ ধরণের নানান রাসায়নিক পদার্থ দেহে বহুগুণ বেশি অনিষ্ট করতে পারে।

তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিয়েশন

পারমাণবিক চুল্লী, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর জায়গা, এবং পরীক্ষার খাতিরে পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে নিষ্কৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থ আমাদের পরিবেশ ও শরীরকে ধীরে ধীরে দূষিত করছে। খনির ইউরেনিয়াম ও সেগুলির মেশিন–বর্জ্য এবং পারমাণবিক চুল্লীর নিঃশেষিত–জ্বালানী আমাদের শরীরের জন্য ভয়াবহ। পারমাণবিক চুল্লীর নিঃশেষিত জ্বালানী ২৫০ শতাব্দী অবধি তেজস্ক্রিয় থাকে। ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পারমাণবিক অস্ত্রধারী সব সরকারই পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণের কুফল নিয়ে বিশেষ আলোচনা করতে চায় না। কিন্তু গবেষণায় জানা গেছে মেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্যের ওপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব যথেষ্ট। যে অঞ্চলে পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়ছে তার কাছাকাছি গর্ভধারণে অসুবিধা, গর্ভপাত, বিকলাঙ্গ ও মৃতশিশু প্রসব, এবং স্তনের ক্যানসার বেশি হতে দেখা যায়।

তড়িৎ–চৌম্বকীয় অঞ্চল (ইলেক্‌ট্রো–ম্যাগনেটিক ফিল্ড)

ইলেক্‌ট্রিক তারে, ইলেকট্রিক–চালিত যন্ত্রপাতিতে যখন ইলেক্‌ট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন তড়িৎ–চৌম্বকীয় ক্ষেত্র বা ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড (ই এম এফ) তৈরি হয়। এ ক্ষেত্র চোখে দেখা যায় না। বাড়িতে যেসব ইলেকট্রিকের জিনিস ব্যবহার করা হয়, তাতে এই ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড

কোথায়	*কি*	*ফলাফল*
বাতাস	গাড়ির ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া, ধূলো, ছাই, রাসায়নিক বাষ্প, কীটনাশকের গুঁড়ো	শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা
পরিবেশ	কার্বন ডায়ক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লুরোকার্বন	ওজোন হ্রাস, বিশ্ব পরিবেশ উষ্ণায়ন
জল	কলকারখানার রাসায়নিক বর্জ্য, কৃষিজমির কীটনাশক, আগাছা ধ্বংস করার ওষুধ, জঞ্জালস্তুপ থেকে নিসৃত দূষণ	রোগ, পরিবেশ দূষণ
খাদ্য	কীটনাশক, রাসায়নিক সার, খাদ্য-সংরক্ষণে ব্যবহৃত বস্তু	অসুখ, শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশে সমস্যা
দালান, গৃহ	সীসা-যুক্ত রঙ (এখন বে-আইনী)	শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের সমস্যা
	গৃহ পরিষ্কার করার জন্য রসায়নিক পদার্থ; ব্যক্তিগত প্রসাধন দ্রব্য	বিষাক্ত ধোঁয়া এবং অবশিষ্টাংশ থেকে অসুস্থতা
	কার্পেট, প্রেসবোর্ড ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ফরম্যালডিহাইড	অসুস্থতা
	রেডন গ্যাস, রাসায়নিক পদার্থ, কার্বন মনোক্সাইড, বায়ু-দূষণ	ক্যানসার, মস্তিষ্ক, ও স্নায়ুর সমস্যা

খুব বেশি শক্তিশালী নয়, কিন্তু হাই-টেনশন লাইনে, যেখানে অনেক শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহিত হচ্ছে সেখানে এটি যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারে। অতি-ক্ষমতাসম্পন্ন ই এম এফ স্বাস্থ্যের ওপর কী প্রভাব ফেলে তা নিয়ে কিছু গবেষণা হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটিতে লিউকোমিয়া এবং ক্যানসারের সঙ্গে ই এম এফ-এর সম্পর্ক দেখা গিয়েছে। তবে বিজ্ঞানীরা এর অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে একমত নন। এই মতদ্বৈততার দরুণ কোন দেশেই এ-সম্পর্কে এখনও বিধি নিষেধ আরোপ করা হয় নি। সাধারণত ই এম এফ-এর শক্তি উৎস থেকে তিন ফুটের মত দূরে যেতে যেতে কমে যায়। তাই সঠিক দূরত্ব বজায় রাখলে এ থেকে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

স্তনের ক্যানসার

স্তনের ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা কার বেশি?

- প্রত্যক মহিলারই স্তনের ক্যানসার হতে পারে।
- শতকরা ৫০ ভাগ স্তনের ক্যানসার ধরা পড়ে পঞ্চাশোর্ধ মহিলাদের শরীরে।
- যদি মা বা বোনের মত নিকট আত্মীয়ার স্তনের ক্যানসার হয়ে থাকে তাহলে সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- যদি এক স্তনে ক্যানসার হয়ে থাকে তাহলে অন্য স্তনে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি।
- যদি বেশি বয়সে মাসিক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয় (মেনোপজ)।
- যদি মাসিক ১২ বছর বয়সের আগে আরম্ভ হয়ে থাকে।
- যদি প্রথম সন্তান ৩০ বছর বয়সের পরে হয়ে থাকে।
- যেসব মহিলার কোন সন্তান হয় নি।
- যদি ওজন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে ৪০ শতাংশ বেশি হয়।
- যদি ফ্যাট বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ অতিরিক্ত বেশি পরিমানে খান।

স্তনের ক্যানসার এড়াতে কেমন করে অগ্রণী হবেন?

স্তনের ক্যানসার বেশিরভাগ সময়ে মহিলারা নিজেরাই আবিষ্কার করেন। এই ক্যানসার যদি প্রথম দিকে ধরা পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা বেশি। সঠিকভাবে স্তন পরীক্ষা করতে শিখলে এই ক্যানসার প্রথম অবস্থাতেই আবিষ্কার করা যায়। সুতরাং প্রতি মাসে নিজের স্তন পরীক্ষা করা খুবই প্রয়োজনীয়।

স্তন পরীক্ষার সঠিক সময় কখন?

প্রতিমাসে মাসিক আরম্ভ হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পরে যখন ব্যথা এবং ফোলা চলে গিয়ে আপনার স্তন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, তখন পরীক্ষা করুন। যদি আপনার মাসিক সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে (মেনোপজ) তাহলে মাসে একটি দিন বেছে নিয়ে নিয়মিত স্তন পরীক্ষা করুন। যদি অপারেশন করে আপনার জরায়ু বাদ দেওয়া হয়ে থাকে তবে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন কোন সময়ে আপনার স্তন পরীক্ষা করা উচিত। আপনার বয়স যদি ২০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হয়, তাহলে প্রতি তিন বছর অন্তর ডাক্তারকে দিয়ে আপনার স্তন পরীক্ষা করান। যদি আপনার বয়স ৪০ বছরের বেশি হয় তাহলে প্রতি বছর ডাক্তারকে বলুন স্তন পরীক্ষা করতে।

স্তন পরীক্ষার সময় যদি অস্বাভাবিক কিছু পান?

নিজের স্তন পরীক্ষার সময়ে যদি অস্বাভাবিক কোন মাংসপিণ্ড বা শক্ত কিছু অনুভব করেন তাহলে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ভয় পাবেন না। এ ধরণের বেশির ভাগ মাংসপিণ্ড থেকে ক্যানসার হয় না। কিন্তু আপনার ডাক্তারই ভাল বুঝতে পারবেন কি করা উচিত।

ম্যামোগ্রাম বা ম্যামোগ্রাফি কি?

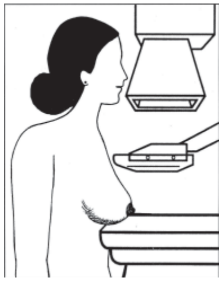

খুব সামান্য এক্সরে রশ্মি দিয়ে স্তনের ভেতরকার ছবি তোলাকে ম্যামোগ্রাম বলে। অনেক সময় হাত দিয়ে অনুভব না করতে পারা গেলেও ম্যামোগ্রামের সাহায্যে স্তনের ভেতরের খুব ছোট মাংসপিণ্ডও ধরা পড়ে। স্তনের ক্যানসার প্রথম অবস্থায় ধরা খুবই প্রয়োজন। আপনার বয়স যদি ৪০ থেকে ৪৯–এর মধ্যে হয়, প্রতি দু বছর অন্তর ম্যামোগ্রাম করান। ৫০ বছরের পরে প্রতি বছর ম্যামোগ্রাম করা জরুরী।

পরিবেশ এবং কর্মক্ষেত্রে বিপত্তি–স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব

স্বাস্থ্যের ওপর পরিবেশের প্রভাব বুঝতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে যে আমাদের দেহপ্রণালী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, জীবনের বিভিন্ন অভ্যাস, আমাদের কাজ, এমনকি বৃহত্তর পরিবেশ, সব কিছুই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। তাই পরিবেশে কোন বিপত্তি ঘটলে তার সরাসরি প্রভাবে আমাদের কোন একটি অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে অথবা সম্পূর্ণ দেহপ্রণালী জখম হতে পারে। এর ফলে অন্য কোন জটিল শারীরিক সমস্যার সূচনা ঘটতে পারে।

বাস্তবে একই সময়ে আমাদের একাধিক সংকটের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। একাধিক বিপত্তির ফলাফল পৃথক ভাবে বিচার করলে সঠিক উত্তর পাওয়া যায় না। একসঙ্গে দুটি সংকট যোগ হলে তার ফলাফল যুগ্ম ভাবে বহুগুণ বেড়ে যায়। এছাড়া কোন বিষাক্ত বস্তুর সংস্পর্শে আমরা কতক্ষণ এসেছি, কী ভাবে এসেছি, এবং সেই বস্তু বা বস্তুগুলি কতটা বিষাক্ত, তার ওপর আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে।

বিষাক্ত পদার্থ ত্বক (স্পর্শে), ফুসফুস (নিঃশ্বাসে), বা খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে (খেয়ে বা পান করে) শরীরে প্রবেশ করতে পারে। বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে

এলে প্রথমে জ্বালা, গা লাল হয়ে যাওয়া, বা পেটে ব্যথা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এ সব পদার্থ বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গের ক্ষতি করতে পারে। এ সব পদার্থ মাংস এবং হাড়ে প্রবেশ করে অসুবিধা ঘটাতে পারে। কী ধরণের বিষাক্ত পদার্থ, কী পরিমাণে এবং কত সময় ধরে এটি শরীরে ঢুকেছে, তার ওপর নির্ভর করবে শরীরের কতটা ক্ষতি হতে পারে। শুধু তাই নয়, আমাদের জীবনের বিভিন্ন সময়ে এই ক্ষতি বিভিন্ন আকার নিতে পারে।

সাধারণভাবে বিষাক্ত পদার্থ লিঙ্গভেদ করে না – স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে একই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া, যকৃতের সমস্যা, মাথা ধরা, শ্বাস–প্রশ্বাসের কষ্ট, ফুসফুসের ক্যানসার, মানসিক প্রতিবন্ধিতা, এবং প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা সবারই হতে পারে। পরিবেশের বিপত্তি আমাদের শরীরের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং স্বাস্থ্যের অন্যান্য সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে।

ত্বকের অসুখ

আমাদের শরীরের সবচেয়ে বিস্তৃত অঙ্গ হল ত্বক বা চামড়া। ত্বক ছিদ্রযুক্ত (পোরাস) বলে রাসায়নিক পদার্থ বা অন্য কোন বস্তু সহজেই এটি ভেদ করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ত্বকের অসুখ অনেকের হয়। এর মধ্যে একটি হল কনট্যাক্ট ডার্মেটাইটিস বা চামড়ায় কিছু লেগে চুলকানি। লেটেক্স (রাবারের মত জিনিষ), কিছু কিছু দ্রবণ (সলভেণ্ট), ও কীটনাশক জাতীয় ওষুধ হাতে বা গায়ে লাগলে এ ধরণের চুলকানি হতে পারে। কীটনাশক থেকে অ্যালার্জিক ডার্মেটাইটিস হতে পারে। সেই জন্যে হাসপাতালের কর্মীরা অনেক সময়ে রবারের দস্তানা পরে কাজ করেন। এ ধরণের দস্তানা পরলে বিষাক্ত পদার্থ, জীবাণু, বা রোগীর দেহের কোন দূষিত বর্জ্য পদার্থ হাতে লাগতে পারে না। কিন্তু দস্তানায় লেটেক্স থাকলে অনেকের সমস্যা হয়। সেইজন্যে আজকাল লেটেক্স ছাড়া দস্তানা তৈরী হচ্ছে।

শ্বাস ও ফুসফুসের অসুখ

বায়ুদূষণ, ধূমপান, এবং কর্মক্ষেত্রে দূষিত পদার্থের সংস্পর্শে শ্বাসনালী ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, এম্ফসিমা, এবং হাঁপানী বা অ্যাসমা হতে পারে। অফিস বা বাড়ির বদ্ধ বাতাস, যেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (এয়ার কণ্ডিশনার) একই বাতাস বারবার ঘুরিয়ে সঞ্চালিত করছে সেখানে আসবাবপত্রে ব্যবহৃত দূষণ সৃষ্টিকারী রঙ বা অন্য কোন বস্তু নিঃশ্বাস–প্রশ্বাসের সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। যাঁদের হাঁপানী আছে বায়ু দূষণের ফলে তাঁদের অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে। যাঁরা শ্বাসজনিত অসুখে ভুগছেন, সাধারণ ধুলো তাঁদের সমস্যা বাড়াতে পারে। সিগারেট, বিড়ি, বা সিগারের ধোঁয়ায় দূষণজনিত শারীরিক সমস্যা আরও

বৃদ্ধি পায়। কয়লার গুঁড়ো, তুলো, রুটি বানানোর কারখানায় ময়দা এসব শ্বাসজনিত এবং ফুসফুসের অসুখ বাড়ায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে প্রতি বছর পৃথিবীতে ২৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর জন্যে বায়ুদূষণ প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী।

বহুবিধ রাসায়নিক-সংবেদনশীলতা (সেনসিটিভিটি)

বহুবিধ রাসায়নিক সংবেদনশীলতা বা মাল্টিপ্‌ল কেমিক্যাল সেন্সিটিভিটিজ-কে (এম সি এস) অনেক সময়ে পরিবেশ-জনিত অসুখ বলা হয়। অল্প পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিতে অনেকেরই কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু এই অসুখ যাঁদের আছে তাঁদের হয়। যাঁদের এম সি এস আছে, তাঁরা অনেক সময়ে প্রসাধন দ্রব্য, ডিজেল তেল, পত্রিকার কাগজ, তোষক, বা অগ্নি নির্বাপক ওষুধ যুক্ত কাপড়, প্রেসবোর্ড, কীটনাশক ইত্যাদির সংস্পর্শে এলে অসুস্থ বোধ করেন। এই অসুখের বিভিন্ন লক্ষণগুলি হল দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানো, চোখে ঝাপসা দেখা, শুনতে অসুবিধা হওয়া, স্মৃতি বিভ্রম হওয়া, খিঁচুনি, ইত্যাদি। এম সি এস এক ধরণের প্রতিবন্ধকতা এবং এতে কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। ভারতীয় ডিসেবিলিটি অ্যাক্টে যে ছয়টি প্রতিবন্ধকতার বর্ণনা রয়েছে, এম সি এস তার আওতায় সোজাসুজি পড়ে না।

সংক্রামক রোগ

যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস বি, সি ভাইরাস, এবং হিউমান ইম্যুনোডেফিশিয়েন্সি ভাইরাস (এইচ আই ভি) অত্যন্ত সংক্রামক। সতর্ক না হলে যাঁরা স্বাস্থ্যকর্মী, সমাজসেবী, জেল কর্মী, যৌনকর্মী, এবং যাঁরা মানুষের দেহ নিঃসৃত তরল যেমন, রক্ত, থুতু, প্রস্রাব, বীর্য, ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন তাঁদের মধ্যে এসব রোগ অন্যের থেকে সংক্রামিত হতে পারে। এই রোগগুলি ঐ কর্মীদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে সেখান থেকে আবার অন্যান্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। এই রকম অনেক রোগ দেহনিঃসৃত তরল বা রক্তের মাধ্যমে অথবা বায়ুবাহিত হয়ে অন্যান্যদের সংক্রামিত করে।

খাদ্যে সাল্‌মোনেলা বা ই-কোলাই জাতীয় জীবাণু থাকলে সেটি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়া, এমন কি মৃত্যু ঘটাও সম্ভব। সেই জন্যে, খাবারে হাত দেওয়ার আগে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেওয়া উচিত। মানুষের খাওয়ার বাসনপত্র হাঁস-মুরগী ও অন্য জন্তুকে খাবার দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করবেন না। কাঁচা মাছ-মাংস কেটে বা ধরে হাত ভালো করে সাবান দিয়ে না ধুয়ে সেই হাতে অন্য খাবার ধরা বা খাওয়া অনুচিত।

প্রজনন সংক্রান্ত স্বাস্থ্যের বিপদ

যখন কোন বস্তু বা অবস্থা নারী ও পুরুষের প্রজনন ক্ষমতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে বা ভ্রূণের সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষতি করে, তখন সেটিকে প্রজনন স্বাস্থ্যের বিপদ বলে মনে করা হয়। এই বিপদগুলি নানা ভাবে আসতে পারে। প্রজনন স্বাস্থ্যের বিপদ কীটনাশকের সংস্পর্শে এলে যেমন হতে পারে, তেমনই ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে এক্স-রে করাতে গেলেও হতে পারে। আবার ক্রমাগত ভারি জিনিস তুললেও এম সি এস হতে পারে।

মহিলারা সন্তান জন্ম দেন বলে প্রজনন স্বাস্থ্যের বিপদকে অনেকসময়ে তাঁদের সংকট বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রজনন স্বাস্থ্যের বিপদ পুরুষদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। বীর্য উৎপাদন কমে যাওয়া বা বীর্যে যথেষ্ট সংখ্যায় শুক্রকীট না থাকা প্রজনন সংক্রান্ত বিপদেরই উদাহরণ। অতিরিক্ত পরিবেশ দূষণ হলে সন্তান ধারণের ক্ষমতা কমে যায় এবং গর্ভপাত ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেবার সম্ভাবনা বাড়ে।

প্রজনন সমস্যার মধ্যে মেয়েদের ঋতুজনিত সমস্যাও পড়ে। তার সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে আরও অনেক সমস্যা। যেমন পূর্ণ-মাস হওয়ার আগেই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া, জন্মের সময় শিশুর ওজন কম হওয়া, শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ না হওয়া, এবং নানা ধরণের জন্মগত-ত্রুটি। বিষাক্ত বস্তু প্রজনন সহায়ক হর্মোনগুলির কাজে বাধা উৎপত্তি করে, ঋতুচক্রে গোলযোগ সৃষ্টি করে, যৌন-ইচ্ছা কমিয়ে দেয়, এমন কি ডিম্বকোষের ক্ষতিসাধন করতে পারে। শুধু তাই নয়, পরিবেশের দূষিত বস্তুগুলি মেয়েদের ডিম্বাণুর জিন-এর ক্ষতি করতে পারে।

কর্মক্ষেত্রে যেসব বস্তুর সংস্পর্শে মেয়েরা আসে, তাদের অনেকগুলি (যেমন, সীসা, বিভিন্ন দ্রবণ বা সলভেন্ট, কিছু কিছু কীটনাশক ইত্যাদি) তাদের প্রজনন ক্ষমতার ক্ষতি করে। গবেষণায় দেখা গেছে এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ কর্মক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যা জন্তুদের প্রজনন ক্ষমতার পক্ষেও ক্ষতিকর। তবে মানুষের শরীরে সেগুলির প্রভাব ঠিক কী হবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। এছাড়া যেসব কাজের ধরণ (যেমন বিভিন্ন শিফ্‌টে কাজ করা) মহিলাদের প্রজনন সহায়ক হর্মোনের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং যে সব পদার্থ মেয়েদের শরীরে এস্ট্রোজেন হর্মোনের মাত্রা পরিবর্তন করে অথবা এস্ট্রোজেন-এর কাজগুলির অনুকরণ করে (যেমন কীটনাশক), সেগুলি সম্পর্কে আরও গবেষণার প্রয়োজন। কাজ করার সময়ে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা, ঝুঁকে জিনিস তোলা-নামানো, কিংবা জিনিস বারবার তুলে রাখার মত কাজ, মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতার কোন ক্ষতি করছে কিনা তাও জানা দরকার। পরিশেষে, কর্মজনিত মানসিক চাপ ও দূষণের যুগ্ম প্রভাব আমাদের প্রজনন ক্ষমতার কী ক্ষতি করতে পারে তা এখনও আমাদের অজ্ঞাত।

স্তনের দুধ দূষিত হওয়া

মায়ের বুকের দুধই শিশু সন্তানের শ্রেষ্ঠ খাদ্য বলে চিরকাল গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু ইদানীং কালে দেখা যাচ্ছে মেয়েদের চর্বি বা ফ্যাটে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ জমতে শুরু করেছে। ফলে মায়েরা যখন সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ান, সেই বিষাক্ত পদার্থ চর্বি থেকে বেরিয়ে স্তন্যদুগ্ধে মিশে শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। ১৯৯৩ সালে এক গবেষণায় দেখা যায় পাঞ্জাবের ৮০ শতাংশ খাবারের স্যাম্পেল–এ বিষাক্ত ডি ডি টি–র অস্তিত্ব রয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং স্তন্যদুগ্ধে ডি ডি টি পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে দিল্লীর যেসব শিশু এখন মায়ের দুধ খাচ্ছে, তাদের শরীরে নিরাপদ মাত্রার চেয়ে ৪৬ গুণ বেশি ডি ডি টি ঢুকছে। ১৯৮২ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুযায়ী সংখ্যাটি ৪৬ গুণের থেকেও অনেক বেশি। গবেষণা পত্রটি আরও জানায় মায়ের বুকের দুধের দূষণ ছাগল বা মহিষের দুধের থেকে বহুগুণ বেশি। যদিও ১৯৮৯ সাল থেকে জনস্বার্থের খাতিরে চাষবাসে ডি ডি টি ব্যবহার আইনতঃ বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে (যেমন, ম্যালেরিয়া রোধে) ডি ডি টি–র ব্যবহার ২০০৭ সাল পর্যন্ত চলেছে। তার জের বহুকাল ধরে চলবে।

(সূত্র: ইনফোচেঞ্জইণ্ডিয়া ওয়েবসাইট)

সাধারণভাবে শিশুর পুষ্টির জন্যে মায়ের বুকের দুধ সবচেয়ে ভালো, কারণ এতে সুরক্ষার অনেকগুলি অনুপান থাকে যা ফর্মুলা দুধে নেই। তাই মায়েদের যতটা সম্ভব দূষণমুক্ত পরিবেশে রাখা সমাজের কর্তব্য। কীটনাশক এবং অন্যান্য দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থের সংস্পর্শ থেকে মহিলাদের দূরে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য বাস্তবে এই নীতি কার্যকরী করা খুবই কঠিন। আমাদের খাদ্য এবং জলবায়ু এখন বিষাক্ত। সমগ্র পরিবেশকে দূষণমুক্ত না করতে পারলে ব্যক্তিবিশেষকে দূষণমুক্ত করা অসম্ভব।

অন্তঃস্রাবের কাজে বাধা (এণ্ডোক্রিন ডিসরাপশন)

অন্তঃস্রাব বা এণ্ডোক্রিন প্রণালী আমাদের শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে (যেমন, শরীরী সুরক্ষা, স্নায়ু, থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড, প্রজনন, ইত্যাদি) প্রভাবিত করে। বহু রাসায়নিক পদার্থ যা ওষুধে বা কল–কারখানায় ব্যবহার করা হয় তা আমাদের অন্তঃস্রাবী প্রণালীর কাজকে ব্যাহত করতে পারে। তাই এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে অন্তঃস্রাব ব্যাহতকারী দূষণ (ই ডি সি)।

জলে, বাতাসে, ও খাদ্যে ই ডি সি–র দরুণ ক্যানসার ও প্রজনন সমস্যা (এণ্ডোমেট্রিওসিস, আকস্মিক গর্ভপাত, টিউব্যাল প্রেগন্যান্সি ইত্যাদি) বাড়ছে বলে মনে করা হয়। শরীরে প্রবেশ করলে ই ডি সি মহিলাদের শরীরে এস্ট্রোজেন–এর পরিমাণ পরিবর্তন করে দেয়। স্বাভাবিক মাত্রায় এস্ট্রোজেন শরীরে না থাকালে মহিলাদের দেহে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। এতে স্তনের ক্যানসারও হয়।

স্তনের ক্যানসার

ভারতবর্ষে স্তনের ক্যানসার দ্রুত গতিতে বাড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্তনের ক্যানসার হবার সম্ভাবনা সাত জনের মধ্যে একজনের। সেই তুলনায় ভারতবর্ষের সংখ্যা এখনও কম – অনুমানিক ২২ জনের মধ্যে একজনের। কিন্তু আমাদের দেশে বহু অসুখই ঠিকমত নথিভুক্ত করা হয় না বলে তথ্যটি নির্ভরযোগ্য নয়।

স্তনের ক্যানসার হবার কারণ নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। কারণগুলি পরিষ্কার ভাবে জানতে পারা গেলে মহিলারা এ ব্যাপারে কিছুটা সতর্কতা গ্রহণ করতে পারবেন। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে স্তনের ক্যানসার বৃদ্ধির মূলে পরিবেশ দূষণের প্রভাব রয়েছে। কিছু কিছু রাসায়নিক বস্তু শরীরে প্রবেশ করলে যে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বাড়ে তা প্রমাণিত হয়েছে। শরীরের চর্বির মধ্যে ডায়ক্সিন ও কিছু কিছু কীটনাশক সহজেই দ্রবীভূত হয়। পরে এইসব রাসায়নিক পদার্থ, স্তনের কোষগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে কাজ করতে দেয় না এবং ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বাড়ায়।

তবে খাওয়াদাওয়া নিয়ে সতর্ক হলে ও নিয়মিত ব্যায়াম করলে অনেক ধরণের রোগ হবার সম্ভাবনা কমে যায়। কিন্তু নিজেকে সুস্থ রাখার বোঝা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তিবিশেষের ওপর চাপিয়ে দেওয়াটা অনুচিত। মহিলাদের কাজ করে খেতে হয়। সুতরাং কর্মক্ষেত্র আর পরিবেশ যদি সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার অনুকূল না হয় তাহলে প্রশাসন ও কলকারখানার কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হবে। এতে রাজনৈতিক ফায়দা নেই বা লাভে ঘাটতি পড়বে বলে মনোযোগ না দিলে উত্তরোত্তর এই অবস্থার অবনতি ঘটবে এবং শেষ পর্যন্ত অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

(সূত্র: মিডিয়ানেট ওয়েবসাইট)

কি ভাবে স্তন পরীক্ষা করবেন

১ *স্নান করার সময়ে*

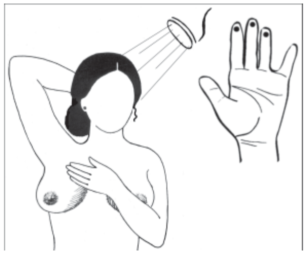

স্নান করার সময়ে আপনার স্তন পরীক্ষা করুন। স্নানের সময়ে ত্বক ভিজে এবং মসৃণ থাকে বলে হাত দিয়ে স্তন পরীক্ষা করা সহজ হয়। আপনার বাঁ হাতের তালু মাথার পেছনে রাখুন। তারপর ডান হাতের সব আঙুল সোজা করে বাঁ স্তনের ওপর সমতল করে রাখুন এবং বেশ জোরে চাপ দিয়ে গোটা স্তনের ওপর আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাকুন। খেয়াল রাখুন আঙুলে কিছু অনুভব করতে পারছেন কিনা। একই ভাবে ডান হাত মাথার পেছনে রেখে বাঁ হাত দিয়ে ডান স্তন পরীক্ষা করুন। স্তন পরীক্ষার সময় অস্বাভাবিক কিছু অনুভব করলে উপেক্ষা করবেন না। ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কোন কিছুতে সন্দেহ হলেও তাই করুন।

২ *আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে*

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার দু হাত শরীরের পাশে ঝুলিয়ে আপনার স্তন দুটিকে খুঁটিয়ে দেখুন। তারপর দু হাত সোজা মাথার ওপর তুলে দিন। লক্ষ্য করুন স্তনের বোঁটায় বা গঠনে কোন অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়েছে কিনা। স্তনের কোন অংশ ফুলেছে কি? কোথাও গর্ত হয়েছে বা স্তন বোঁটা দিয়ে কোন রস বের হচ্ছে কি? এরপর আপনার হাত দুটিকে কোমরে রাখুন এবং ভেতর থেকে চাপ দিয়ে বুকের মাংসপেশী শক্ত করুন। আবার চোখ দিয়ে স্তন পরীক্ষা করুন। মনে রাখবেন আপনার দুটি স্তনের গঠন হুবহু এক রকম নাও হতে পারে। নিয়মিত পরীক্ষা করলে নিজের স্তনের স্বাভাবিক গঠন সম্বন্ধে আপনি সচেতন হবেন এবং স্তনে কোন পরিবর্তন ঘটলে সহজেই ধরতে পারবেন।

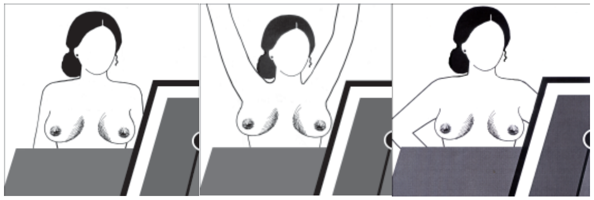

৩ *শোয়া অবস্থায়*

শোয়া অবস্থায় নিজের স্তন পরীক্ষা করুন। ডান স্তন পরীক্ষার সময় ডান কাঁধের নীচে একটি ছোট বালিশ বা তোয়ালে ভাঁজ করে রাখুন। ডান হাত ওপর তুলে তালু মাথার পেছনে রাখুন, সামান্য পাশ ফিরে শোন। এবার বাঁ হাতের বড় তিনটি আঙুল সোজা করে ডান স্তনের ওপর সোজা করে রেখে বৃত্তাকারে ঘোরাতে থাকুন। হাত না তুলে সম্পূর্ণ স্তন এভাবে পরীক্ষা করুন।

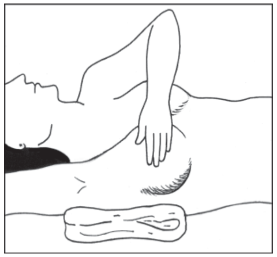

এই ভাবে স্তন এবং আশে পাশের পেশী, বগলের নীচ, এবং গলার হাড় অবধি পরীক্ষা করুন। স্তন পরীক্ষার সময় আঙুল ঘোরাবার তিনটি পদ্ধতি আছে। যে পদ্ধতি আপনার পক্ষে সহজ হয় তাই করুন।

- বৃত্তাকারে (ঘড়ির কাঁটার মত)
- ওপর নীচে
- বাইরে থেকে ভেতরে কোনাকুনি ভাবে।

স্তন পরীক্ষার সময় বুড়ো আঙুল এবং তর্জনী দিয়ে স্তনের বোঁটা ধরে চাপ

দিন। যদি স্তনের বোঁটায় রক্ত বা কোন জলীয় পদার্থ লক্ষ্য করেন, ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

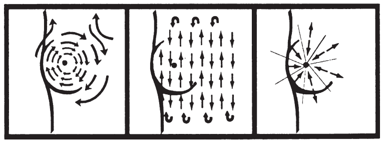

কানে কম শোনা

কানে শোনার ক্ষমতা কমে যাওয়া কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। কম শুনতে পাওয়ার জন্যে কাজের জায়গায় বিপদের সাইরেন বা ওয়ার্নিং বেলও অনেক কর্মীরা শুনতে পান না। ফলে অনেক সময় জীবন সংশয় ঘটতে পারে। কানে কম শোনার নানান কারণ থাকতে পারে। কোন গুরুতর আঘাতে শোনার ক্ষমতা কমে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধীরে ধীরে এই অবস্থা সেরে যায়। কাজের জায়গায় অত্যাধিক শব্দ, বিশেষ বিশেষ ধাতু নিয়ে কাজ, উত্তাপ, অ্যাসফিক্সিয়েন্ট (যার উপস্থিতিতে শরীরে অক্সিজেন কমে যায়), ইত্যাদির ফলে ধীরে ধীরে শ্রবণশক্তি হারিয়ে যায়। অল্প অল্প করে শ্রবণশক্তি হারালে আমরা তা চট করে ধরতে পারি না এবং এই ক্ষতি বুঝতে বুঝতেই সময় চলে যায়। শ্রবণশক্তি একবার হারাতে আরম্ভ করলে তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গত শব্দদূষণ নিয়ে সচেতনতা এখন একটু বাড়ছে। কিন্তু শব্দ দূষণ যে শুধু বিরক্তিকর তা নয়, এই দূষণ আমাদের শ্রবণক্ষমতাকে ধীরে ধীরে নষ্ট করে দেয়। এ ব্যাপারটা আমরা অনেকেই জানি না

পিঠে ব্যথা

কর্মজগতে আমাদের কাজের ধরণের জন্যে পিঠে ব্যথা হওয়া সম্ভব। বহু মহিলা শ্রমিক পিঠের ব্যথায় ভোগেন কারণ তাঁদের ক্রমাগত ভারী জিনিস তুলতে হয় এবং এই ভার তাঁদের ওজন তোলার স্বাভাবিক ক্ষমতার থেকে অনেক ক্ষেত্রেই বেশি হয়। অথবা তাঁরা এমন ভাবে জিনিস তোলেন যে পেশীতে বেশি চাপ পড়ে। এ ব্যাপারে ঠিকমত শিক্ষা, ওজনের ভার নির্দিষ্ট করা, ওজন তোলার জন্য যন্ত্র ব্যবহার করা ইত্যাদি কর্মীদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করবে।

পায়ে এবং পায়ের পাতায় ব্যথা

সারাদিন ধরে দাঁড়িয়ে কাজ করা খুবই কষ্টদায়ক। নার্স, আয়া, সেলস কর্মী, রাঁধুনী, গৃহকর্মী – এঁদের সবাইকেই অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। অনেক কাজ (যেমন ঘর ঝাঁট দেওয়া বা মোছা) নীচু হয়ে করতে হয়। এইসব কাজে রক্ত নিম্নাঙ্গে নেমে ভেরিকোজ ভেইন হতে পারে। গর্ভবতী মহিলাদের পক্ষে

এইসব কাজ খুবই কষ্টদায়ক।

সম্ভব হলে একটা চেয়ার বা টুল কাছে রেখে দিন যাতে মাঝে মাঝে সেখানে বসে বিশ্রাম নিতে পারেন। ঘর পরিষ্কার করা যদি আপনার কাজের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তাহলে এমন ধরনের ঝাঁটা বা ঘর মোছার মপ বেছে নিন যেটি আপনি বসে বা দাঁড়িয়ে ব্যবহার করতে পারবেন। কোমর বেঁকিয়ে বা নীচু হয়ে ঘর পরিষ্কার করবেন না।

ঘাড়ে, কাঁধে, এবং হাতে ব্যথা বা আঘাত পাওয়া

কারখানার কর্মীদের বেশির ভাগ সময় একই কাজ বার বার করতে হয়। একই কাজ বারবার করলে অথবা বেকায়দায় কোন কাজ করলে আঘাত পাবার সম্ভাবনা থাকে। কারখানার কর্মীদের মধ্যে ঘাড়ে ব্যথা অথবা স্টিফ-নেক এবং কর্পেল টানেল সিনড্রোম (যার শেষ পর্যায়ে মুঠো করার ও সূক্ষ্ম কিছু তোলার ক্ষমতা কমে যায়) ধরণের অসুস্থতা প্রায়ই ঘটে।

হঠাৎ পড়ে গিয়ে হাত পা মচকানো মূহুর্তের মধ্যে ঘটে যায়। কিন্তু একই কাজ বারবার করার ফলে যে ব্যথা বা অসুস্থতা দেখা দেয় তা হয় ধীরে ধীরে। সেরে যাওয়ার পরেও একই অসুস্থতা আবার দেখা দিতে পারে যখন সেই পুরোনো কাজ আবার শুরু করতে হয়। দৈনন্দিনের ছোটখাট ব্যথা বেদনা সাধারণত আমরা উপেক্ষা করি, কারণ কাজ করে খেতে হবে। কিন্তু সেই অল্প অল্প ব্যথা বেদনা হঠাৎ একদিন গুরুতর আকার নিতে পারে। ব্যথা উপেক্ষা করে জোর করে কাজ করার খেসারত পরে গুণতে হয়।

বিজ্ঞানের একটি শাখা এর্গোনমিক্‌স যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র কেমন করে বানালে মানুষের দেহের কোন ক্ষতি হবে না তাই নিয়ে গবেষণা করে। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, কর্মীরা যন্ত্র নিয়ে কাজ করার সময় এবং আসবাব ব্যবহারের সময় যাতে নিজের ক্ষতি না করে। এছাড়া কাজের জায়গায় কতটা আলো থাকা উচিত, কী ভাবে কাজ করা উচিত, কাজের ফাঁকে কতটা বিশ্রামের প্রয়োজন, সে বিষয়েও অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য এর্গোনমিক্‌স-এর দৌলতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বড় বড় কারখানায় এইসব নির্দেশ কিছুটা মানা হলেও ছোটখাটো জায়গায় একেবারেই মানা হয় না।

কর্মক্ষেত্রে বাতাসের অবস্থা

বহু কলকারখানার আভ্যন্তরীণ বাতাস এতোই দূষিত যে সেখানে কাজ করলে

মাথা ধরে, চোখ জ্বালা করে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, গলা খসখস করে, ও বমি পায়। এমন অবস্থায় কর্মীদের শরীরের যে ভীষণ ক্ষতি হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

মানসিক চাপ

শারীরিক কারণে মানসিক চাপ বৃদ্ধি ঘটতে পারে যেমন, কম আলোয় কাজ করা, বসার ভালো বন্দোবস্ত না থাকা, বেশি আওয়াজ, গরম, চোখের ব্যথা, কাজের চাপ, ইত্যাদি। সহকর্মীদের সঙ্গে বনিবনার অভাব, বস-এর সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক, যৌন হেনস্থা, কাজের অনিশ্চয়তা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ইত্যাদিও মানসিক ও শারীরিক চাপ বৃদ্ধি ঘটায়। এছাড়া কাজে উন্নতির সুযোগ না থাকা, প্রসবকালীন ছুটি না পাওয়া, সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তা ইত্যাদি নানান কারণেই মানসিক চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

শিফ্‌টের কাজের কুফল

শিফ্‌ট-এর কাজে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা বেশি হয়। ঘুরে ঘুরে দিনে ও রাতে কাজ করতে হলে হজমের গোলমাল, ঘুমের সমস্যা, অসতর্ক হয়ে যাওয়া, মনঃসংযোগে অসুবিধা, ইত্যাদি অনেক কিছুই হতে পারে। যাঁরা শিফ্‌টের কাজ করেন তাঁদের মধ্যে ধূমপান করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। কাজের সময় ক্রমাগত পরিবর্তনের দরুন সামাজিক ভাবে মেলামেশা করা এবং জীবনে স্থায়িত্ব আনাও তাঁদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে।

যে মহিলারা শিফ্‌টের কাজ করেন তাঁদের অনেকেই মানসিক কষ্টে ভোগেন এবং অনেক সময়েই ঘুমের ওষুধ ছাড়া ঘুমোতে পারেন না। এই কাজ তাঁদের পারিবারিক সম্পর্কেও সমস্যার সৃষ্টি করে। আপনাকে যদি শিফ্‌ট ডিউটি করতেই হয়, তাহলে চেষ্টা করুন ঘন ঘন শিফ্‌ট না বদলে যদি অন্ততঃ তিন সপ্তাহ একই শিফ্‌টে কাজ করতে পারেন। অন্যান্য সহকর্মীদেরও উদ্বুদ্ধ করুন এই দাবী জানাতে। নিজেরা উদ্যোগী হয়ে চাপ না দিলে কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকবে।

হেনস্থা ও নির্যাতন

যেসব ব্যবসায়ে বহু মহিলা কাজ করেন যেমন, চা-বাগান, হাসপাতাল, রেডিমেড জামাকাপড় তৈরীর কারখানা, বেশ্যালয়, নাইট ক্লাব ইত্যাদি, সেখানে মেয়েদের আহত হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ব্যর্থ প্রেমিক, সন্দেহপ্রবণ স্বামী বা কোন বিক্ষুব্ধ সহকর্মী বা খদ্দেরের হাতে অনেক সময়ে মেয়েরা সেখানে খুনও হন। এ ছাড়া টাকাপয়সা কেড়ে নেওয়া উদ্দেশ্য তো থাকেই। খুন হবার সম্ভাবনা বাড়ে

যদি কোন মেয়ে একা একা বা অল্প কয়েকজনের সঙ্গে কাজ করেন বা অনেক রাত্রি পর্যন্ত কাজে থাকেন।

কী করে নিরাপদ হওয়া যায়?

বাড়ি, কাজের জায়গা, ঘরে এবং বাইরে, সব জায়গাতেই কিছু বিপদ আমাদের স্বাস্থ্যহানি করতে পারে। এগুলো সম্পূর্ণভাবে এড়ানো সম্ভব নয়। তবে এ ধরণের বিপদ কিছুটা এড়ানো যায় যদি আমরা নিজেদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে পারি, কেনাকাটার সময় চিন্তাভাবনা করি, এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারে সতর্ক হই। দলবদ্ধ ভাবে কাজের জগতের এবং প্রতিবেশী মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আমরা আনতে পারি। আমাদের কর্মক্ষেত্র ও পরিবেশ যাতে নিরাপদ থাকে সে ব্যাপারে আমাদেরই সচেষ্ট হতে হবে।

বাড়িতে –

প্রথমে যে পরিবেশ নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে তা হল নিজেদের বাড়ি। প্রথমেই দেখা দরকার আমরা কী কিনছি, কী ব্যবহার করছি, কী জমিয়ে রাখছি, এবং কী ভাবে বর্জনীয় বস্তু ফেলে দিচ্ছি। খুঁটিয়ে দেখতে হবে বাড়ির আসবাবপত্র কি দিয়ে তৈরী, বাড়ির ছাদ কি অ্যাসবেসটসের? আমাদের বাড়ির বা জানলা দরজার রঙে কি সীসে আছে?

আমাদের করণীয়

কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত একক প্রচেষ্টায় জনস্বার্থ মামলা এনে বহু পরিবর্তন এনেছেন। কিন্তু পরিবেশ নিয়ে একা যুদ্ধ করা কঠিন। এখন কিছু কিছু বেসরকারী সংগঠন এ ব্যাপারে সরব হয়েছেন। আমাদেরও দলবদ্ধভাবে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। যাঁরা পরিবেশের উন্নতির জন্য কাজ করছেন, তাঁরা বলেন:

- যে কোন পরিষেবা নেওয়া বা জিনিস কেনার আগে আমাদের সচেতন হতে হবে। জিনিস কেনার আগে তার লেবেল-এ কি লেখা আছে তা ভাল করে পড়ে নিন। ফলমূল বা সব্জি-র সাইজ বড় মানেই সেগুলো ভাল তা নয়। এগুলিতে কীটনাশক এবং বহু রকম জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি যুক্ত থাকতে পারে। এ বিষয় নিয়ে যে সব বেসরকারী সংগঠন কাজ করছে তাদের কাছে জেনে নিন কোথায় অকৃত্রিম উপায়ে তৈরী ফসল বিক্রি হচ্ছে। সেই সব সংগঠনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের আন্দোলন জোরদার করুন। বড় আকারের মুরগী কেনার ব্যাপারে সতর্ক হোন। অনেক সময়ে মুরগির সাইজ বড় করার জন্যে হর্মোন দেওয়া হয়। হর্মোন যুক্ত মুরগি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

- আপনার অঞ্চলে বায়ুদূষণের মাত্রা কতটা তা প্রশাসনের কাছে জানতে চান। নিরাপদ মাত্রার থেকে এই অঙ্কের তফাৎ কতটা তা জেনে প্রশাসন এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রশ্ন করুন। এ ব্যাপারে সচেতন এবং সচেষ্ট হয়ে দলবদ্ধভাবে প্রশাসনকে চাপ দিন। সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকা আপনার অধিকার। দুর্ভাগ্যবশত, পশ্চিমবঙ্গে সরকার এখনও পরিবেশ-দূষণ নিয়ে বেশি মাথা ঘামান না। কিন্তু এই নিয়ে হৈচৈ হলে এবং পত্রপত্রিকায় লেখালেখি চললে দেখবেন সবাই নড়ে চড়ে বসছে।
- আপনার প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলুন। সংগঠিত ভাবে জমি-মাফিয়া, রাজনৈতিক পার্টি-ক্যাডার, রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রিত গুণ্ডাবাহিনী, এবং ব্যবসায়ীদের ইচ্ছেমত জমির অপব্যবহার, দূষিত বর্জ্য শোধন না করে ফেলে দেওয়া, জলাশয় বুজিয়ে ফেলা, ইচ্ছেমত পথঘাট দখল করা, এ সবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অতি অল্প কয়েকজন দুষ্কৃতিকারীর জন্যে অজস্র নাগরিকের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনিও অগ্রণী হতে পারেন।
- আপনার ও আপনার পরিবারের স্বাস্থ্য নিয়ে একটা চার্ট রাখুন। তাতে কোথায় কাজ করেন এবং থাকেন, কী কী অসুখ হয়েছে, কোন বিষাক্ত জিনিসের সংস্পর্শে এসেছেন কিনা, তার বিশদ বিবরণ লিখে রাখুন।
- কোন গবেষণা পত্র যদি বলে যে কোন একটি বিশেষ পদার্থ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, তাহলে প্রথমে খোঁজ নিন ঐ গবেষণার টাকা কে জুগিয়েছে। অনেক সময়ে বিশেষ কোন কোম্পানী গবেষকদের টাকা দেয় তাদের পছন্দ মত সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার জন্যে। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন গবেষণার ফলাফল ঠিক কি আর গবেষক কিসের ভিত্তিতে ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।
- যদি মনে করেন কোন কারখানা দূষণ ছড়াচ্ছে, তাহলে দলবদ্ধভাবে সেই কোম্পানীর তৈরী জিনিস কেনা বন্ধ করুন। আপনার বাড়ির আশেপাশে ব্যাঙের ছাতার মত হকার ঢুকে পরিবেশ দূষিত করলে তাদের কাছ থেকে জিনিস কেনা বন্ধ করুন।
- যেসব সংস্থা পরিবেশ ও কর্মক্ষেত্রে পরিবেশ সমস্যা নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছে, তাদের সঙ্গে যোগ দিন। সমষ্টিই হল শক্তি। আমার বাড়ির কাছে কিছু ঘটছে না বলে এইসব অন্দোলন উপেক্ষা করবেন না। মনে রাখবেন একদিন আপনার বাড়ির আশেপাশেও একই জিনিস ঘটতে পারে। অবিচার যেখানেই হোক, সেটা অবিচার। দলবদ্ধভাবে প্রতিরোধ না করলে অবিচার বন্ধ হয় না।

বাড়িতে যেসব বিপদ ঘটতে পারে

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিপদ	কি করতে হবে
খাবার: দীর্ঘকালব্যাপী বিভিন্ন ধরণের সমস্যা	টাটকা মাছ মাংস খান; যেসব খাবারে বেশিদিন টিকিয়ে রাখার জন্যে সংরক্ষক বা প্রিসার্ভেটিভ দেওয়া থাকে সেগুলি খাবেন না; ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধা বা ফ্রোজেন খাবার না খাওয়াই মঙ্গল। তবে একান্তই যদি খেতে হয়, ফ্রোজেন খাবার ভালো দোকান থেকে কিনুন; লেবেল–এ কি লেখা আছে তা ভালো করে পড়ুন।
সীসে–যুক্ত রঙ, সীসের গুঁড়ো এবং চটা ওঠা রঙের চিলতে: মস্তিষ্কের ক্ষতি কিডনি–র ক্ষতি প্রজনন সমস্যা স্নায়ুর ক্ষতি	পুরনো রঙে সীসে থাকার সম্ভাবনা আছে। যে জায়গায় রঙ করা হবে সেখান থেকে রঙ ঘষে না তুলে তার ওপরে নতুন রঙ লাগান। ডাক্তারকে জানান ছেলেমেয়েরা হয়ত বিষাক্ত সীসের সংস্পর্শে এসেছে। খেতে বসার আগে বাচ্চারা যেন ভালো করে হাত ধোয় তা দেখবেন। কোন মতেই যেন তারা রঙের চিলতে বা রঙের গুঁড়ো মুখে না দেয়।
কার্বন মনোক্সাইড: *কম পরিমাণে* –মাথা ধরা বমি বমি ভাব *বেশি মাত্রায়* –জীবন সংশয় হতে পারে	প্রদীপ বা হারিকেন জ্বালিয়ে কিংবা কয়লার উনুন জ্বলতে থাকলে দরজা জানলা বন্ধ করে শোবেন না।
ছ্যাৎলা: অ্যালার্জি মাথা ধরা শ্বাসজনিত অসুখ	ভিজে জায়গায় ছ্যাৎলা বন্ধ করা কঠিন। ছ্যাৎলা পড়লে জামাকাপড় রোদে দিন। যা রোদে দেওয়া যায় না, সেগুলো ভালো করে মুছে পরিষ্কার করে রাখুন।
খাবার জল: আর্সেনিক, সীসে, উদ্বায়ী কার্বন–যৌগ, কীটনাশক, ক্লোরিনের যৌগ, ইত্যাদি বিভিন্ন উপসর্গ	আমাদের গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক এবং কঠিন সমস্যা; আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চলে আর্সেনিক–শোধিত পাম্প থেকে জল নিন; সে সব না থাকলে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন; স্থানীয় পঞ্চায়েতকে চাপ দিন জল–পরীক্ষার করার বন্দোবস্ত করতে।
বাড়িতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ:	নানান উপসর্গ

দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের দেশের কর্মক্ষেত্রে খুব অল্প জায়গাতেই স্বাস্থ্য সহায়তা থাকে। স্বাস্থ্য সংকট হলে সেটা মোকাবিলা করার মতো পরিকাঠামো আমাদের দেশে নেই। সরকারী সাহায্যের জন্যে কোন একটি সরকারী সংস্থা নেই। কর্মক্ষেত্রের ওপর নির্ভর করছে কোন মন্ত্রণালয়ের কোন বিভাগ এই দায়িত্ব নিয়েছেন।